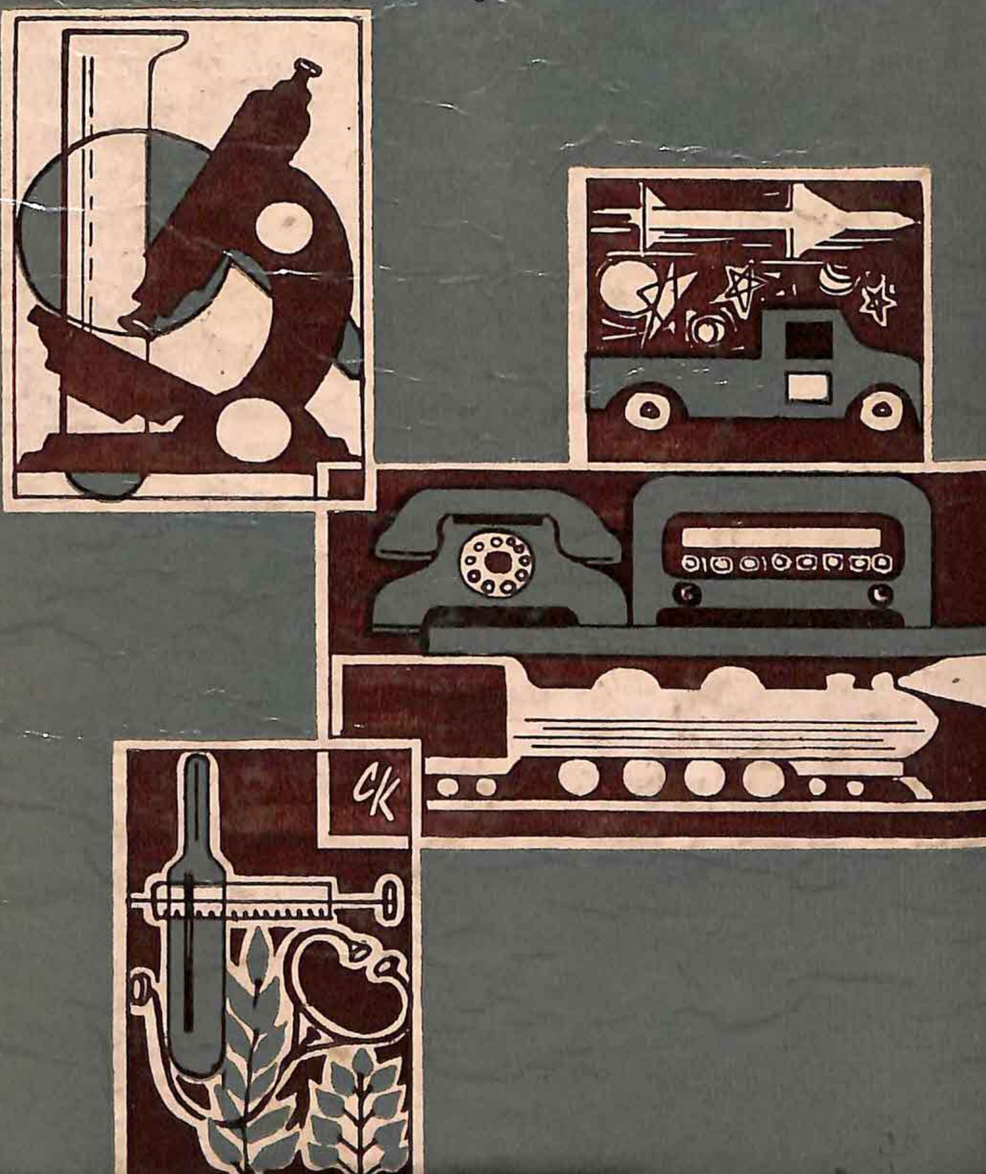
দূরকে করেছে আপন



দূরকে করেছে আপন

ভাস্করাচার্য

লিপিকা
৩০/১ এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
ডি, চক্রবর্ত্তী
৩০/১ এ, কজেল রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৮৯

মূল্য ঃ ৮·০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর ঃ
মানস কোলে
শ্রীগুরু প্রিণ্টার্স
২৭, সূর্যসেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া

সুমেধা কে।

14-8-90

প্রসঙ্গত ঃ

সম্ভবত সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষের মনে জেগেছে জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসা তার আশপাশ সম্পর্কে, সে জিজ্ঞাসা তার দেখা শোনার মধ্যে যা আছে তাতে সম্পর্ক তো বটেই, এমন কি, যা তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে তার সম্পর্কেও তার জানার ইচ্ছেটা সমান। মানুষের এই যে জানার ইচ্ছে, এটাই তাকে যে বিশেষ জ্ঞানের দিকে নিয়ে গেল তারই নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষকে যেমন করল সচেতন তেমনি প্রতিদিনই তার জানার ভাণ্ডারটাকে ভরিয়ে দিল নতুন নতুন আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে।

একথা সত্য, আদিম যুগের মানুষ ছিল প্রায় একটা জায়গাতেই বন্ধ। কিন্তু যেদিন সে চাকা আবিষ্কার করল সেদিন থেকেই শুরু হ'ল তার দূরকে জয় করার সাধনা। সেই সাধনা থেকেই স্থলে এল গাড়ি, রেল, মোটর ইত্যাদি। জলে এল ভেলা, নৌকা, জাহাজ। আকাশে ওড়ার জন্য এল বিমান। শুধু তাই নয় টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, দূরদর্শন সবই দূরকে নিয়ে এল একবারে মানুষের ঘরের মধ্যে। মানুষের এই যে দূরকে জয় করার সাধনা—তারই কথা ছোটদের বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মতকরে বলার চেষ্টা করেছি এই বইয়ে। মানুষের এই জয়ের কথা পড়ে ছোটরা যদি নতুন কিছু করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় তাহলেই সার্থক মনে করব নিজের পরিশ্রমকে।

ইতি—

ভাস্করাচার্য

৭।৭।৮৯

১ চাকা



আদ্যিকালের মানুষ থাকত পাহাড়ের গুহায় গাছের, কোটরে। থাকত তারা জোট বেঁধে। চাষবাস প্রথমটায় জানত না—তাই বনের ফল, পশু পাখি ছিল তাদের খাবার। এই খাবারের সন্ধানে ছুটোছুটি করতে হতো তাদের। কিন্তু কোন যানবাহন না থাকায় তাদের যাতায়াতটা ছিল সীমাবদ্ধ। দূর পৃথিবীর কোন্ খবরই তারা রাখত না।

কিন্তু যখন নেমে আসত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ—তখন ভয়ে মানুষ ছাড়ত তার পুরনো আস্তানা—খুঁজে পেতে বের করত তাদের থাকার নতুন জায়গা। আর এইভাবেই এক জায়গার মানুষ পেঁছিত আরেক জায়গায়—চিনত নতুন জায়গা।

তবে একটা কথা, মানুষ কোনদিনই থেমে থাকেনি একটি জায়গায়। যত দিন গেছে—ততই সে আবিষ্কার করেছে নতুন নতুন জিনিস—প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভাবন করেছে নানা সামগ্রীর।

এই আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রথম যেদিন আগুন জ্বালতে শিখল সেদিন থেকেই শুরু হ'ল তার জীবনের এক নতুন ধারা। আদিম মানুষ প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেল সভ্যযুগে।

এই সভ্যতার পথে এগোতে গিয়েই মানুষ একদিন দেখল—দুটো পায়ের ওপর ভর করে তার এই যে চলা—তাতে নেই যথেষ্ট গতি। সে ছুটতে পারে—কিন্তু দৌড়ে তাকে হার মানিয়ে দেয় বনের হরিণ থেকে শুরু করে অনেক পশুই। মানুষ দেখে এদের দৌড় আর ভাবে কেমন করে সে অর্জন করবে এই গতি—কেমন করে যাতায়াতটা হবে অনায়াস।

মানুষের এই ভাবনা—তার এই প্রয়োজনই তাকে একদিন বশ মানাতে শেখাল বনের পশুকে। শক্তি বা গতিতে পরাজিত হয়েও মানুষ তার বুদ্ধির জোরেই সওয়ার হ'ল পশুর পিঠে। দূরত্ব তার কাছে হার মানল অনেকটাই।

কথায় আছে—'খেতে পেলে শুতে চায়'। মানুষেরও হ'ল তাই। পশুর পিঠে সওয়ার হবার পরেই তার মনে সাধ জাগল—আহা, বেশ আরাম করে যদি বসা যেত আর পশুতে টেনে নিয়ে যেত সেই বসার জায়গাটা—তাহলে ব্যাপারটা হ'ত ভারি মজার।

মজা করতেই মানুষ মন দিল গাড়ি তৈরিতে। সে গাড়ি ছিল অনেকটা আজকের শ্লেজ গাড়ির মত। কিন্তু তার চলার পথটা ছিল না খুব মসৃণ। এবড়ো খেবড়ো পথে কখনও উল্টে যেত তার গাড়ি— গড়িয়ে যেত তার মালপত্র।

তাই আবারও ভাবতে বসল মানুষ। এই ভাবনার সূত্রেই মানুষ একদিন আবিষ্কার করল চাকার। এবার তার জীবনে এল সত্যিকারের গতি।

মানুষের এই চাকা আবিষ্কারটা কবে কখন—কিভাবে হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাসটা আজ আর কোনমতেই জানা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয়—কেমন ছিল সেই আদিম চাকা—কিংবা কি ভাবে তৈরি করা হয়েছিল সে চাকা। তবু একটা কথা খুব জোর দিয়েই বলতে হয়—চাকার আবিষ্কার মানুষের গোটা জীবন

ধারাকেই দিল বদলে। অন্য কথায়—চাকাই মানব সভ্যতাকে টেনে নিয়ে গেল প্রগতির পথে।

চাকা সারা বিশ্বের মানুষেরই জীবন ধারায় নিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষ করে পরিবহণের ব্যাপারটাকে চাকা করল অনায়াস এবং দ্রুত। যাতায়াত তো বটেই—মাল পরিবহণটা তার কাছে হয়ে উঠলো অনেক সহজ। অনেক কম কষ্টে মানুষ অনেক বেশি মাল অনেক বেশি দূরে অনেক তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে শিখল। ওইসঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা জনবসতির মধ্যে গড়ে উঠতে থাকল যোগাযোগ।

সভ্যতা যত এগোতে থাকল—মানুষের মধ্যে জিনিসপত্র এবং ভাবের আদান প্রদানও ততই বাড়তে থাকল। বণিক কুল এক-জায়গার মাল নিয়ে যেতে লাগল আরেক জায়গায়। প্রয়োজনের ভিত্তিতে হতে থাকল প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রীর আদান প্রদান। আর এরি ফলে মানুষের জীবন ধারাতে এল পরিবর্তন। গড়ে উঠতে থাকল গ্রাম, শহর—নগর। চাকার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকল সভ্যতার রথ।

মাটি খুঁড়ে পুরনো জিনিসপত্র খুঁজে পেতে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক মানুষের সভ্যতার উৎসটা খুঁজে বেরাচ্ছেন—তাঁরা সঠিকভাবে আজও বলতে পারেন না—কুমোরের চাক অথবা গাড়ির চাকা কোনটার উদ্ভাবন হয়েছিল আগে। বলতে না পারার কারণ, কুমোরের চাকা—কিংবা গাড়ির চাকা—সবই তৈরী হয়েছিল কাঠ দিয়ে। আর কাঠ তো অজয়—অক্ষয় নয়—তাই তা গেছে পচে—ভেঙে—কিংবা অন্য কোন ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে তা। তাই, প্রাচীন সেই চাকার নিদর্শন খুঁজে বের করতে পারেন নি তারা—তবে প্রত্যক্ষ কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও—সেই চাকার চেহারা, রূপ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সেই যুগের

মানুষের আঁকা গুহা চিত্র কিংবা মাটির তলা থেকে খুঁজে পাওয়া কুমোরের চাকে তৈরির জিনিসের টুকরোটাকরা থেকে।

কুমোরের চাকের এই নিদর্শন পাওয়াটা সহজ হলেও গাড়ির চাকার এমন ধারা প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পুরনো চাকাওয়ালা গাড়ির অস্তিত্বের যে খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে এধরনের গাড়ি ছিল। ওই অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা, মাটির যেসব কাজ খুঁজে পেয়েছেন তার একটিতে দেখা গেছে চাকাওয়ালা গাড়ির ছবি।

যে জায়গা থেকে চাকাওয়ালা গাড়ির ছবি আঁকা মাটির ফলক পাওয়া গেছে প্রায় সেখানেই পাওয়া গেছে কুমোরের চাকে তৈরি মাটির বাসন পত্রেরও টুকরো। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে এগুলি সবই প্রায় একই যুগে তৈরি। কাজেই কুমোরের চাক, না গাড়ির চাকা—কোনটার উদ্ভাবন আগে হয়েছিল—তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত।

চাকা উদ্ভাবনের ইতিহাসটা তাই প্রায় সবটাই এখন আমাদের অনুমান আর কল্পনা দিয়ে তৈরি। নানা অনুমানের মধ্যে সবচেয়ে চালু ধারনাটা হচ্ছে, চাকা সৃষ্টির মূলে রয়েছে কাঠের গুড়ি। বড় বড় কাঠের গুড়িকে মানুষ রোলারের মত গড়িয়ে নিয়ে যেত এবং এই ভাবে কাঠকে গড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতেই একদিন তার মাথায় আসে চাকা তৈরির চিন্তাটা।

এধরনের চাকার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ায়—খৃষ্টের জন্মের তিনহাজার থেকে দুহাজার বছর আগে তৈরি সমাধি গুহা থেকে। সে চাকা তৈরি হয়েছে তিনটি বড় তক্তাকে জোড়া লাগিয়ে—মাঝের তক্তায় রয়েছে একটি গর্ত এবং সেটাই কাজ করছে কীলকের। গর্তের চার পাশের কাঠের অবস্থা দেখে বোঝা যায়, চাকাটা ঘুরত একটা স্থির দন্ডের

ওপর। কিন্তু ওই গুহা থেকে যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা থেকে পুরো গাড়ির চেহারাটা আজ মালুম করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার।

চাকার মূল নক্শায় প্রথম বড় রকম উন্নতি ঘটানো হল ওই তিন তক্তার চাকার ওপর কাঠের বেড় দিয়ে। ফলে চাকাটা এবার হ'ল অনেক বেশি গোল—এবং সমান। একটা গাছের ডালকে বাঁকিয়ে গোল করে এই চাকার বেড় তৈরি হয়ে থাকতে পারে, আবার অনেকগুলো টুকরো দিয়েও তৈরি হয়ে থাকতে পারে ওই বেড়।

মেসোপটেমিয়া থেকেই প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে তৈরি একটি চাকার বেড়ে তামার পেরেক মারা দেখা গেছে। ওই-সময়ই সম্ভবত চাকার বেড়ে চামড়ার ব্যবহার শুরু হয়। এরও প্রায় পাঁচশ বছর পরে অর্থাৎ আজ থেকে হাজার চারেক বছর আগে চাকায় ধাতুর তৈরি বেড় ব্যবহার শুরু হয়।

মোটামুটি ওই সময়ই চাকার চেহারায় পরবর্তী রূপান্তরটা এসেছে সম্ভবত মেসোপটেমিয়া কিংবা তুরস্কে। ওই চাকায় তখন স্পোক বা অর ব্যবহার করা শুরু হয়।

অর বা চাকার পাকি ব্যবহারে শুরু হয় যুদ্ধরথে। চাকা-গুলোকে হাল্কা এবং দ্রুত চলার উপযোগী করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পাকি লাগানো চাকা তৈরি করা হ'ত একটি ফুটোওয়ালা কাঠের কেন্দ্রস্থল বা নাভির থেকে আড়াআড়িভাবে দু'টি অর বা দণ্ড লাগিয়ে। এরসঙ্গে আবার আড়াআড়িভাবে লাগানো হ'ত অতিরিক্ত দণ্ড বা অর। এজাতীয় চাকার যে প্রাচীন নিদর্শনটি ইতালি থেকে পাওয়া গেছে সেটি খৃষ্টপূর্ব হাজার বছর আগের তৈরি।

তবে খৃষ্টের জন্মের দেড়হাজার বছর আগেই মিশরীয়রা অর

লাগানো যুদ্ধরথ তৈরি করেছিল। অন্যান্য নানা জায়গা থেকে ৬টি বা ৮টি অর যুক্ত চাকাও পাওয়া গেছে।

বলা যায় মোটামুটি এই সময়ই চাকার একটা বাঁধা নক্শা তৈরি হয়ে যায়। শুধু চাকা তৈরি নয়, এই চাকাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা যেতে থাকে। হাওয়া কল, কিংবা জল কলেও এই চাকাব্যবহার হতে থাকে। এরপর চাকা তৈরির ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনটা আসে গত ১৬শ শতকে।

চাকার ধাতুর অর ব্যবহার শুরু হতে থাকে এক বিশেষ ভঙ্গিমায়। তারপর থেকে চাকা তৈরির সামগ্রীর পরিবর্তন হয়েছে —কাঠের বদলে লোহা, অ্যালুমিনিয়মের সংকর বা অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি হতে শুরু হয়েছে। একইভাবে টায়ার টিউবও ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার মানব সভ্যতার গতি আনার মূলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা এই চাকার।

———



আদিম মানুষ প্রথম দিকে তার খাবারের জন্যই শুধু পশুর পেছনে ছুটতো। শিকার করে পশুকে খাদ্যে পরিণত করা ছাড়া তাকে দিয়ে যে অন্য কাজ হতে পারে এটা প্রথমে তার মাথাতেই আসেনি।

কিন্তু প্রয়োজন মানুষকে পশুর সম্পর্কে অন্য ভাবে ভাবতে শেখাল। সে দেখল রোজ রোজ শিকার মেলে না, আবার কোন সময় হয়ত এতো শিকার মিলে যায় যে, সবটা খেয়ে শেষ করা যায় না। তাই মানুষ ভাবল, যদি এমন হতো, বনের পশু তার ঘরে থাকবে, আর সে তার দরকারমত মেরে খাবে তাদের, তাহলে সেটা হতো ভারি—মজার আরামের ব্যাপার।

মজার ব্যাপারটাকে শুধু কল্পনায় না রেখে তাকে সত্যি করার জন্যই একদিন মানুষ পশুকে না মেরে তাকে ফাঁদে ফেলে এবং অন্য ভাবে জ্যান্ত ধরতে শুরু করল এবং সেই জ্যান্ত পশুকে বন্দি করে রাখল তার খাবার জন্য।

এইভাবে পশুকে আটকে রাখতে গিয়েই মানুষ একদিন অবাক হয়ে দেখল, ঠিকমত রাখতে পারলে এই বন্দি অবস্থাতেই পশু বাচ্চা দেয়, পাখি ডিম পাড়ে। এটা দেখার পরই মানুষের মাথায় এল পশু পালনের চিন্তাটা।

প্রথম দিকে মানুষ পশুকে ধরত শুধু খাবার জন্য। কিন্তু যেদিন থেকে মানুষের মাথায় পশুকে পোষ মানানোর এবং তাকে

পালন করার চিন্তাটা এল সেদিন থেকেই মানুষ তাকে খাওয়া ছাড়া অন্যভাবে ব্যবহার করতে আরম্ভ করল।

শুরুটা আকস্মিকই ছিল। হঠাৎ-ই মানুষ দেখল তার চেয়ে কয়েকগুণ শক্তিশালী এসব পশু অনায়াসে টেনে নিয়ে যায় অনেক জিনিষ যা নিয়ে যেতে এতদিন মানুষকে হিমসিম খেতে হতো। মাল বইবার এবং টানবার এমন একটি মাধ্যমকে ঘরের মধ্যে পেয়ে গিয়ে মানুষের আনন্দ আর ধরে না। মাল বইবার কাজে লাগাতে থাকে মানুষ তার পোষ মানা এইসব পশুকে।

শুধু মাল বওয়া নয়, মাঠে চাষ করতে গিয়েও মানুষ দেখল তার চেয়ে পশুকে দিয়ে লাঙল টানালে কাজটা হয় আরো অনেক ভাল এবং অনেক সহজ। তাই লাঙল টানার জন্য মানুষ কাজে লাগতে থাকল গরু, মোষ এবং ঘোড়ার মত জন্তুজনোয়ারকে।

এইভাবে মাল বওয়াতে এবং লাঙল টানাতে গিয়েই একদিন মানুষ গাড়ি তৈরি করে তার সঙ্গে পশুকে জুড়ে দিতে শুরু করল। প্রথমদিকে এসব গাড়িতে চাকা ছিল না—তাই এবড়ো খেবড়ো পথে টেনে নিয়ে যাওয়া গাড়িতে যাতায়াত করাটা সওয়ারের পক্ষে খুব একটা আরামের হতো না। কিন্তু চাকা আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষের গাড়িরও ঘটতে থাকল উন্নতি। সে তৈরি করতে থাকল নানা রকম গাড়ি।

আগের কালের রথ থেকে শুরু করে একালের নানা গাড়ি দেখলে, দেখা যাবে—মানুষ কখনও ব্যবহার করেছে দুটি চাকা, কখনও তিনটি, কখনও আবার চার বা তার বেশি চাকা। তবে সাধারণভাবে দুই বা চার চাকার গাড়িই মানুষকে দিয়েছে বেশি আরাম। চাকা আবিষ্কারের এবং পশুকে ব্যবহারের আগেও মানুষ যে গাড়ি ব্যবহার করেনি তা নয়। পাল্কি, ডুলি জাতীয়

গাড়ি গুলিতে মানুষকে বয়ে নিয়েছে মানুষই। আজও অনেক জায়গায় রয়েছে মানুষে টানা রিক্সা।

যাক সেকথা, আমাদের দেশের গরুর গাড়ি বা এক্কা গাড়িতে থাকে দুটি করে চাকা, আবার ঘোড়ার গাড়িতে থাকে চারচাকা। চারচাকার গাড়িগুলি বেড়াবার পক্ষ একটু বেশি আরামদায়ক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মানুষের বেড়াবার নেশাটা একটু বেশি মাত্রায় বেড়েছিল। ফলে এই সময়ই গাড়ি নিয়ে শুরু হয়ে যায় নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা। নানারকম ছাউনির ব্যবহার যেমন শুরু হ'ল, তেমনি বসার জায়গারও নানারকম হেরফের করা হল। গদি এ'টে গাড়িকে করে তোলা হতে থাকল রীতিমত আরামের জিনিস।

রাজা মহারাজা অথবা বড়লোকদের থাকল নিজস্ব গাড়ি। সে সব গাড়ির জাঁকজমকটা যেমন বেশি তেমনি আরামের জন্যও ছিল ঢালাও ব্যবস্হা।

রাস্তায় চলার সময় গাড়িতে যাতে ঝাঁকুনি না লাগে তারজন্য এইসময় গাড়ির বসার জায়গাটা চামড়ার দড়ি দিয়ে একটু ঝুলিয়ে রাখা হতো। কিন্তু পরে চামড়ার দড়ির বদলে বসার আসনের নিচে দেওয়া হল লোহার স্প্রিং।

জল ঝড়, রোদের হাত থেকে বাঁচতে গাড়িগুলি থাকত চারিদিকে ঢাকা। এতে বাইরের দৃশ্য দেখতে হতো খুবই অসুবিধা। এই অসুবিধা কাটাতে গাড়িতে ব্যবহার করা আরম্ভ হল জানলার। ইচ্ছেমত সেসব জানলা খুলে বা বন্ধ করে মানুষ গাড়ি করে চলার সময়ও দেখতে পেতো রাস্তার দুধারের সবকিছু।

বিশেষ করে ইউরোপে প্রথম দিকে যে সব গাড়ি ব্যবহার করা হতো তাতে যে শুধু মানুষের বসার ব্যবস্হা থাকত তাই নয়, বলা যায় গাড়ির সঙ্গে চলত তার গোটা ঘর সংসারটাই। বিছানা পত্র, খাবারদাবাড়, বাসন কোসন এমন কি দীর্ঘ ভ্রমনের সময় যাতে

বই পড়া যায় তার জন্য গোটা লাইব্রেরিটিকেই মানুষ নিয়ে যেত এই গাড়ি করে।

ঘোড়ায় টানা এই জুড়ি গাড়ির নানা রকমফের ঘটেছিল অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কোন গাড়ির ছিল চার চাকা কোনটার বা দুটি। চারচাকার এই ধরণের গাড়ির মধ্যে বিখ্যাত ছিল ল্যাণ্ডোগাড়িগুলি। বেশ বড়সড় এই গাড়িগুলির ওপরের ছাউনিটাকে ইচ্ছে করলেই মাঝখান থেকে গুটিয়ে রাখা যেত দু দিকে—যেমন আজকাল সাইকেল রিক্সার চাকা গুটিয়ে রাখা হয় সেই ভাবে। এই গাড়িতে কোচয়ান এবং সহিসদের জন্য থাকত বিশেষ বসার ব্যবস্থা। জার্মানির লাণ্ডো শহরে প্রথম এই ধরণের গাড়ির চল হয় বলে এর নামটা রাখা ওইরকম। তবে গাড়ি চড়ে মানুষ হাওয়া খেত শহরের মধ্যেই। অল্প স্বল্প দূরত্বের মধ্যে। বেড়াবার জন্যই ছিল এই গাড়ি।

যাদের নিজেদের গাড়ি রাখার সামর্থ ছিল না তাদের জন্য ছিল ডাক গাড়ি বা ছ্যাকরা গাড়ি। নির্দিষ্ট পথে চলত ঘোড়ায় টানা এসব গাড়ি এবং ইচ্ছেমত যাত্রী নিতে পারত তারা।

বাষ্পীয় ইঞ্জিন, উদ্ভাবনের পর থেকেই চল কমতে থাকে এসব গাড়ির। তারপর যেদিন পেট্রল চালিত মোটর গাড়ির আমদানি হল সেদিনই প্রায় শেষ হয়ে এল এজাতীয় গাড়ির যুগ। মাল পত্র বইবার জন্য পশুতে টানা গাড়ির ব্যবহার থাকলেও উন্নত দেশে এখন এই ধরণের গাড়ি চল এখন খুবই কম প্রায়—নেই বললেই চলে।

———

৩ | মোটর গাড়ি



ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে মানুষের আশা ঠিক মিটতে চায় না। সে চায় এমন গাড়ি যাকে চালানো যাবে যন্ত্রের সাহায্যে নিজের ইচ্ছেমত—যার গতি হবে ঘোড়ার গাড়ির চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের এই চাওয়ার মধ্য দিয়েই একদিন জন্ম নিল মোটর গাড়ি।

অটোমোবাইল বা স্বয়ংক্রিয় এই গাড়িটিকে এক কথায় এখন সবাই মোটর গাড়িই বলে থাকে। আগেই বলেছি মানুষ চাইছিল এমন গাড়ি যা চালাবার অন্য ঘোড়া বা অন্য কোন জন্তুর দরকার তো হবেই না—এমনকি এই গাড়ির চাকা ঘোরাবার যে শক্তি তাকেও দেখা যাবে না। মানুষের এই চাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্ভাবকরা বহুদিন থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে প্রায় সফল একটা চেষ্টা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

নিকোলাস জোসেফ কগনট নামের এক ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার প্রথম এই ধরণের গাড়ি তৈরিও করে ফেলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তৈরি সে গাড়িটা আজও প্যারিসের জাতীয় জাদুঘরে রয়েছে।

জেমস ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করার পরই কগমট ওই ইঞ্জিনকে কাজে লাগিয়ে মোটর গাড়ি তৈরি করতে চান। সেই

মত তিনি তাঁর গাড়ি এবং ইঞ্জিনের একটা নকশাও করেন। কিন্তু সে সময় স্টিম ইঞ্জিনকে কাজে লাগানো হত কামান বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই কগমটকে তাঁর এই গাড়ি তৈরির জন্য যুদ্ধ বিভাগের অনুমতি নিতে হল।

যুদ্ধ বিভাগ কমগটের সব কথা শুনে বললেন, বেশ বানাও তোমার গাড়ি—দেখা যাক কেমন চলে তা। যুদ্ধবিভাগের অনুমতি পেয়ে কগনট লেগে গেলেন কাজে এবং ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তৈরিও করে ফেললেন একটা গাড়ি। সে গাড়ির ইঞ্জিনটা ছিল যেমন বড়, তেমনি ভারি। গাড়িটা ছিল তিনচাকা সাইকেলের মত। তাতে চারজন লোক বসতে পারত। প্রথম সে গাড়িটা চলেছিল মিনিট কুড়ির মত এবং তার গতি ছিল ঘন্টায় পাঁচ কিমির একটু বেশি।

প্রথম গাড়ির সাফল্যে উৎসাহিত কগনট আরো বড়ো দেখে একটা গাড়ি তৈরি করেন। ভিনসেনিজে পরীক্ষামূলকভাবে এই গাড়িটা চালাবার সময় চালক গাড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়িটা সোজা একটা দেওয়ালে ধাক্কা মেরে গুড়িয়ে ফেলে সেটিকে। এরফলে কগনটের শত্রুরা সবর হয়ে ওঠে এবং এধরনের গাড়ি তৈরির পরীক্ষাটাও বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর কেটে যায় বেশ কিছু বছর। তারমধ্যে ছোটখাট পরীক্ষা চললেও ইন্টারনাল কমবাসন ইঞ্জিন দিয়ে প্রথম মোটর গাড়িটি তৈরি করেন বেলজিয়ামের এক ইঞ্জিনিয়ার। নাম তাঁর জে, জে, ইটাইনে লেনয়ের। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের এক কারখানায় তিনি নিজের নকশামত গাড়িটি তৈরি করান। দেড়-অশ্বশক্তির এই গাড়ির ইঞ্জিনটি চলত হাইড্রোকার্বন নামে এক তরল গ্যাসে। এটির গতি ছিল ঘণ্টায় চার মাইলের মত।

লেনয়েরের এই গাড়িটির খবর কেমন করে যেন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডারের কানে পেঁছায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি

তাঁর জন্য প্রথম একটা গাড়ি তৈরি করে দেবার জন্য লেনয়েরকে বরাত দেন। শেষ পর্যন্ত সে গাড়ির কি হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি।

যাইহোক, এরপরে জার্মানির নিকোলাস অটো ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কাজ চলার মত ইন্টারনাল কমবাসন ইঞ্জিন যুক্ত চার-চাকার আরেকটি গাড়ি তৈরি করেন। এরি মধ্যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মোটর গাড়ির জন্য পেট্রল চালিত প্রথম ইঞ্জিনটি তৈরি করেন এডওয়ার্ড ডেলামের ডিবাউটি ভেলি নামে ২৭ বছরের এক ইঞ্জিনিয়ার। পরবর্তীকালে লোহার চাকার বদলে রবারের টায়ার লাগানোর ব্যবস্থাটিও করেন তিনি।

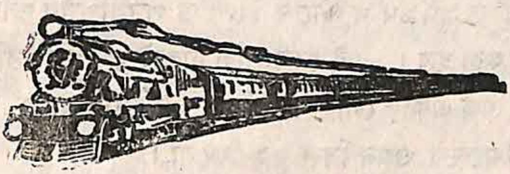
তবে ব্যবসা করার জন্য প্রথম পেট্রলে চলা মোটর গাড়ি তৈরি করেন জার্মানিরই ফ্যাব্রিক কার্লবেনজ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিন-চাকার যে গাড়িটি তিনি তৈরি করেন তার ওজন ছিল ৫৬০ পাউণ্ড। গাড়িটি চলত ঘন্টায় ১৫ কি.মি. বেগে। এরপর গট-লিয়েব ডাইমার তৈরি করেন চার চাকার মোটর গাড়ি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে লোহার চাকাওয়ালা মোটর গাড়িও তৈরি করেন তিনি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মোটর গাড়ির নানারকম উন্নতি হতে থাকে এবং মোটর গাড়ি ক্রমেই আজকের রূপটা পেতে থাকে।

মোটর গাড়ির ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে মোটর গাড়িতে নাম্বার প্লেট বসানোর ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই গাড়িতে যুক্ত হয় ইলেকট্রিক ষ্টার্টার আর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দেই জার্মানিতে মোটরগাড়ির কারখানা স্থাপন করা হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিস থেকে বোর্ডেয়াক্স পর্যন্ত ৭৫০ মাইল বা ১.২০.০ কি.মি পথে হয় বিশ্বের প্রথম মোটরগাড়ি দৌড় প্রতিযোগিতা। ৪৮ ঘন্টায় ওই পথ অতিক্রম করে ওই

প্রতিযোগিতায় প্রথম হন এমিল লেভেসর। তাঁর দুই অশ্বশক্তি সম্পন্ন দুই সিলিন্ডারের গাড়িটি গড়ে ঘন্টায় ১৫ মাইল বেগে চলেছিল। প্যারিসে ফেরার পথে একবার ঘুমিয়ে না পড়লে তিনি আরো আগেই এই পথটা অতিক্রম করতে পারতেন।

মোটরগাড়ির এখন অনেক উন্নতি হয়েছে তবু আরো উন্নতি ঘটাবার চেষ্টার শেষ নেই। পেট্রলের বদলে ইলেকট্রিক ব্যাটারির ব্যবহার বা সৌরশক্তিতে মোটর চালাবার চেষ্টাও চলছে এখন।



কু—ঝিক—ঝিক রেলগাড়িও আজ প্রায় ইতিহাসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এখন বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই রেলগাড়িতে কয়লার ইঞ্জিনের বদলে ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিক বা ডিজেল ইঞ্জিনের। অথচ এই রেলগাড়ি প্রবর্তনের ইতিহাসটা কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়। এই ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে রেলগাড়ির দুশ বছর পূর্তি হল বলা যায়।

লোহার যে দুটি লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে তাকেই ইংরেজিতে বলে রেল। এই রেল বা রেলওয়ের বাংলা অর্থ হল লৌহবর্ত্ম। গাড়ি চালাবার জন্য রেল লাইন ব্যবহারের কথাটা প্রথম মাথায় আসে বৃটিশ খনি শ্রমিকদের। খনি থেকে একটা কয়লা নিয়ে যাওয়া গাড়ির চাকার লিক বা খাত দেখে তাঁরা একটা নির্দিষ্ট বাঁধানো পথে গাড়ি চালাবার বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন।

প্রথম রেলপথটি তৈরি হয় কাঠ দিয়ে। কিন্তু কাঠ ভেঙ্গে যায় দেখে লোহার পাত দিয়ে তা মেরামত করা হয়। তাতে আবার কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়ার গাড়ি বা ওয়াগনের চাকার ক্ষতি হতে থাকে। কেননা সে সময় সে গাড়ির চাকা ছিল কাঠের তৈরি। তাই সবদিক সামাল দিতে পথটা যেমন তৈরি হল লোহা দিয়ে, তেমনই ওয়াগনের চাকাও তৈরি হয় লোহা দিয়ে।

ইংলণ্ডে প্রথম রেলপথটি তৈরি হয় ঘোড়ায় টানা গাড়ি চালাবার জন্য।

শেষ পর্যন্ত ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পুরোপুরি লোহার তৈরি পথ তৈরি করা হয়। এই রেলগুলি ঢালাই লোহার তৈরি। রেল পথের ওই এক একটি লৌহ দণ্ড ছিল ৯০ সেমি বা ৩ ফুট এবং এক একটি দন্ডের ওজন ছিল ২২ কিলো।

প্রথম দিকে এই রেলপথ বা লৌহবর্ত্মে পশুতে টানা গাড়ি চলত। এমনকি বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রবর্তনের পরও বহু দিন পর্যন্ত পশুতে টানা গাড়ি এই রেলপথে চলেছে। যেমন ১৮০১ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ সংসদের আইনের বলে সারে আয়রণ রেলওয়ে কোম্পানি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণের জন্য ওয়াণ্ডসওয়ার্থ এবং ক্রয়ডনের মধ্যে যে রেলপথটি চালু করে তাতে গাড়ি টানত ঘোড়ায়।

ইতিহাস নীরব থাকলেও সাধারণের জন্য প্রথম রেলপথটি চালু হয় লিস্টারশয়ারের লাবার্গে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। উইলিয়াম জেশপ এই রেলপথটি চালু করেন লাবার্গ এণ্ড নানপ্যাটন রেলওয়ে কোম্পানি নাম দিয়ে।

রেলপথে বাষ্পীয় ইঞ্জিনে প্রথম ট্রেনটি চলে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি পেনিডারেন রেলপথে। এটি ছিল ওয়েলসের মার্থির টিউডফিলের কাছে। রিচার্ড ট্রেভিথিকের তৈরি এই ইঞ্জিনটির ইতিহাসটি কিন্তু বড় মজার। প্রথমে এটি ছিল হাতুড়ি চালাবার একটি গতিশীল বাষ্পীয় যন্ত্র। ট্রেভিথিক এই যন্ত্রটির সঙ্গেই একটি ওয়াগনের চেসিস বসিয়ে এটিকে একটি রেলওয়ে ইঞ্জিনে রূপান্তরিত করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি এটি পরীক্ষা-মূলক ভাবে চালালেও যাত্রী নিয়ে ট্রেনটির প্রথম যাত্রা ২০ (মতান্তরে ২১) ফেব্রুয়ারি। যাত্রী ছিলেন মানুয়েল হ্যামফ্রে এবং রিচার্ড ক্রশে এবং সরকারি ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্টনি হিল। তাঁরা পেনিডারেন

থেকে আবারসিনন পর্যন্ত ৯ মাইল পথে ভ্রমণ করেন। এই ইঞ্জিন পাঁচটি কোচ বা গাড়িতে ১০ টন পর্যন্ত মাল এবং ৭০ জন যাত্রী বইতে পারত।

এই রেলপথ চালুর ব্যাপারটি কিন্তু খুব সহজ হয়নি। অনেকেই এর বিরোধিতা করে বলেন, লোহার পথের সঙ্গে লোহার চাকার ঘষার ফলে ট্রেনটি অচল হয়ে যাবে। এই বিরোধিতার অবসান ঘটাতে ট্রেভিথিক একটা অভিনব পথ নিলেন। এই ট্রেন যে অচল হবার নয় এটা প্রচার করার জন্য লণ্ডনের ইউস্টন রোডের কাছে একটা জায়গায় বেছে নিয়ে তিনি বলা যায় একটা সার্কাস খুলে বসেন। সেখানে একটা বৃত্তকার রেল পথে অসংখ্য দর্শকের চোখের সামনে ২৪ কি.মি. বেগে চালাতে থাকেন তাঁর ছোট্ট ট্রেনটি যার নাম তিনি দেন—ক্যাচ—মি—হু—ক্যান—পারলে আমাকে ধর। তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়। হাজার হাজার লোক রেল-পথে এইভাবে ট্রেন চালাতে দেখে ট্রেন ভ্রমনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

স্টিম ইঞ্জিন বা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পাশাপাশি ডিজেল চালিত ইঞ্জিনে প্রথম ট্রেন চলা শুরু হয় প্রুশিয়ান হেসিয়ান রাষ্ট্রীয় রেল-পথে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই ইঞ্জিনের কার্যকারিতা তেমন না থাকায় এটি তখন বাতিল হয়ে যায়। সেদিক থেকে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনে নিয়মিত ট্রেন চলা শুরু হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিউনিসিয়ান রেলপথে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই বাল্টিমোর ওহিও রেলরোড মেইন লাইনে বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেনটি চালাবার জন্য সাড়ে তিন মাইলের পথ বৈদ্যুতিকীকরণ করান। তবে পরীক্ষ-মূলক ভাবে প্রথম বৈদ্যুতিক রেল চালায় এই সংস্থাই ১৮৩৯ খৃঃ।

জেনে রাখা ভাল, রেলপথে প্রথম রেলকার চালান হয় ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টাল ও এক্সটার রেলের টিভার-টন শাখায়। গাড়িটির চাকার সংখ্যা ছিল ছয়।

এইভাবে অন্যান্য জায়গার মত ভারতে প্রথম রেল চলাচল শুরু হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ এপ্রিল বোম্বাইয়ে।

রেল শুধু যে যাত্রী বহন করে তাই নয়, মাল পরিবহনের ক্ষেত্রেও রেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এইসঙ্গে বলতে হয় রেলপথের প্রবর্তনের ফলে বিশ্বের মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগটা যায় রীতিমত বেড়ে।

৫ | নৌকা, জাহাজ



মানুষের সভ্যতাকে চাকা যেমন স্থলপথে দিয়েছে গতি তেমনি জলপথে মানুষকে সুদূরের পিয়াসী করে তুলেছে ভেলা। ভেলা থেকে পরবর্তী কালে তৈরি হয়েছে নৌকা, জাহাজ, ডুবো জাহাজ অনেক কিছুই। কিন্তু সবার আগে মানুষ তৈরি করেছিল যে ভেলা—সেই ভেলাই মানুষকে জলপথে এক জায়গা থেকে নিয়ে গেছে আরেক জায়গায়। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পৃথিবীর নানা জায়গায় মানুষ প্রথম পা রেখেছে এই ভেলাতে চড়েই।

ইতিহাসের নজির খুঁজে বের করা আজ মুস্কিল, তবে একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়, নৌকা তৈরির অনেক আগে মানুষ বাঁশ, কাঠ, ইত্যাদিকে একসঙ্গে বেঁধে তৈরি করেছিল ভেলা সেই ভেলায় চেপে সে নিজে যেত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়—বয়ে নিয়ে যেত মাল। ভেলার চেয়ে অনেক নিরাপদ নৌকা বা জাহাজ আজ পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার হচ্ছে সত্যি, কিন্তু এই ভারতবর্ষ কিংবা আফ্রিকা, এশিয়ার অনেক জায়গাতে এখনও এই ভেলাই ব্যবহার করা হয়।

ভেলা বা নৌকা ব্যবহারের শুরুটা যে কবে তা জানা যায় না সত্যি। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেটা জানবার ইচ্ছাটাকে ছেড়ে দেননি এখনও। এপর্যন্ত যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রে প্রথম নৌকা ভাসিয়েছিল সম্ভবত ক্রিট দ্বীপের অধিবাসীরা। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ক্রিট দ্বীপের

অধিবাসীরা নৌকা চালানোতে এতটা পারদর্শী হয়ে উঠেছিল যে তারা নৌকা সাজিয়ে বাণিজ্যে চলে যেত মিশরে। এমনকি লিপারি দ্বীপেতেও চলত তাদের কেনাবেচা।

যাইহোক, মানুষ জলে ভেলা বা নৌকা ভাসানোর পর থেকেই সেগুলিকে আরো শক্ত, সমুদ্রের বুকে আরো নিরাপদ করার দিকে নজর দিল। তার সেই চেষ্টার ফলেই একদিন নৌকা রূপান্তরিত হল জাহাজে।

সে জাহাজ তৈরি হত কাঠ দিয়ে। কাঠ যাতে জলে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য তার গায়ে লাগানো হতো জল নিরোধক নানা জিনিস। কখনও দেওয়া হত গাবের আঠা, কখনও আলকাতরা, কখনও অন্য আরো নানা জিনিস। এসব জাহাজ বা নৌকার কাঠ-গুলিকে জোড়া দেওয়া হতো যেমন পেরেক দিয়ে তেমনি কাঠের গোঁজ দিয়ে। দাঁড় বেয়ে হাল ঠিক রেখে মানুষ তার গায়ের শক্তিতে বেয়ে নিয়ে যেত এসব নৌকা বা জাহাজ।

তারপর একদিন এই জলযানের গতি বাড়াতে বাতাসকে কাজে লাগানোর জন্য নৌকা বা জাহাজে খাটান হ'ল পাল। মানুষ দাঁড়ের সংখ্যাও দিল বাড়িয়ে।

কিন্তু এতেও মানুষ তুষ্ট হল না। সে চাইল আরো শক্ত পোক্ত আরো দ্রুতগামী জাহাজ। বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের প্রায়



পরপরই ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের এক জমিদার মার্কুইস ক্লদ ফ্রাঙ্কেস তৈরি করান বাষ্প চালিত ছোট্ট একটি জাহাজ। জাহাজটির নাম দেন তিনি পাইয়োস্ক্যাফি। বাষ্পচালিত কাঠের তৈরি

জাহাজটিতে ইঞ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে ছিল দাঁড়। ফ্রান্সের সাওন নদীতে জাহাজটি যখন চলতে শুরু করল তখন মানুষ দেখল স্রোতের উল্টো দিকেও জাহাজটি চলেছে বেশ অনায়াসে। এর আগে জাহাজ বা নৌকা সব সময়ই চলত স্রোতের অনুকূলে।

যাই হোক ফ্রান্সের জমিদারের এই জাহাজের সাফল্যে মানুষ বেশ খুশি হয়ে উঠল। আর তারই ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাষ্পচালিত জাহাজ চলাচল শুরু হয়ে গেল ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ফিলাডেলফিয়ায়। ভেলেয়ার নদীতে এই জাহাজ নিয়ে পারাপারের ব্যবসা শুরু করেন জন ফিচ নামে এক ভদ্রলোক।

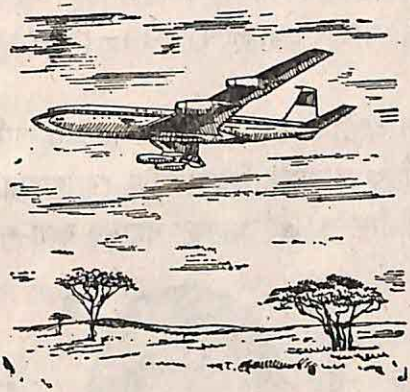
কাঠের বদলে ইস্পাতের তৈরি বাষ্পচালিত জাহাজের শুরু হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। এম. এ. রবার্ট নামে ইস্পাতের ওই বাষ্পীয় জাহাজটি তৈরী হয় বার্কেনহেডের জন লেয়ার্ডের শিপ ইয়ার্ডে। ইস্পাত দিয়ে তৈরি হলেও জাহাজটি দু বছর বাদেই অর্থাৎ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সেন্নায় এক বালিয়াড়িতে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়।

তবে লোহা দিয়ে জাহাজ তৈরি শুরু হয়েছে এর আগেই। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দেই ব্রিস্টলে তৈরি হয় গ্রেটব্রটেন নামে যে জাহাজ তা ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জলে যাতায়াত করে। আর তারও আগে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে অ্যারন মানবি নামে লোহার তৈরি প্রথম বাষ্পীয় জাহাজটি ইংলণ্ড থেকে মাল বোঝাই করে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে প্যারিসে এসে পেঁছিয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ জুন। ১/৪ ইঞ্চি মোটা লোহার চাদর দিয়ে তৈরি হয় এটি।

লোহার তৈরি বাষ্পীয় জাহাজেই মানুষ থেমে থাকেনি। এখন পরমাণু শক্তি চালিত জাহাজও ভাসছে জলে। জলের নিচে চলছে ডুবো জাহাজ। আজ আর জাহাজে সমুদ্রভ্রমণ আগের মত ভয়ের নয়। আর এইসঙ্গে মনে রাখতে হয় নৌকা বা জাহাজই প্রথম বিশ্বকে আনে কাছাকাছি। তিনভাগ জলে ঘেরা এক ভাগ স্থলের মানুষ প্রথম পরস্পরের কাছাকাছি আসে এই জল পথেই। তাই সভ্যতার ইতিহাসে নৌকা বা জাহাজের ভূমিকাটা অসাধারণ।

———

৬ বিমান



আকাশেতে পাখি ওড়ে। এমন কি ছোট্ট যে প্রজাপতি সেও কেমন উড়ে বেড়ায় পাখা নাড়িয়ে। অবাক বিস্ময়ে মানুষ এসব দেখত আর ভাবত, বুদ্ধিতে, শক্তিতে আমরা কত বড় অথচ পারিনা ছোট্ট পাখিটির মত ডানা মেলে আকাশে উড়তে—এই ভাবনা আর উড়তে না পারার আপশোষটাই মানুষকে ভাবাতো কেমন করে সে উড়বে আকাশে।

আমাদের পুরান বা রামায়ণ, মহাভারতে অবশ্য আছে পুষ্পক রথের কথা যা আকাশে উড়ত আজকের বিমানেরই মত। কিন্তু কেমন করে সেগুলি উড়ত তার কোন কথাই লেখা নেই তাতে, তাই এযুগের মানুষ তাকে উড়িয়ে দিত নেহাতই আজগুবি কাহিনী বলে। শুধু আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর নানা দেশের পুরান কাহিনীতে এভাবে উড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও এযুগের মানুষকে সত্যি সত্যি আকাশে ওড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ওই বছরই একজন মানুষ সত্যি আকাশে ওড়ে —অবশ্য বেলুনে চড়ে।

এর অনেকদিন আগে থেকেই নানাভাবে আকাশে ওড়ার চেষ্টা

করেও মানুষ শুধু ব্যর্থই হয়েছে। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে সে চালিয়ে গেছে চেষ্টা। সেই চেষ্টার ফল ফলল ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে।

অবশ্য এটাকে ঠিক ওড়া বলা চলে না বরং বলা ভাল, ওই প্রথম একজন মানুষ আকাশে উঠল—ভেসে রইল কিছুক্ষণ বাতাসে।

দিনটা ছিল অক্টোবর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ তারিখ। ওই দিনই ফরাসি বৈজ্ঞানিক ফ্রানসিস পিয়াত্রে ডি রোজিয়ার বেলুনে ওড়েন। তাঁর কয়েক মিনিটের এই আকাশ ভ্রমনের কথা শুনে হাসি পেতে



পারে, কিন্তু তখন বেলুনে ওড়ার যে কি প্রচন্ড ঝুঁকি ছিল সে কথা মনে করলে মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে যায়।

পিয়াত্রে ডি রোজিয়ারের এই আকাশ ভ্রমন ফ্রান্সেরই মনটগলফিয়ার ভাইদের এমন অনুপ্রাণিত করল যে তাঁরা একটার পর একটা পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন ওই বেলুন নিয়ে।

রোজিয়ারের প্রথম বেলুন ভ্রমনের কয়েক সপ্তাহ পরেই রোজিয়ার এবং মার্কুইস দ্য অল্যান্ডেস আবার বেলুনে করে আকাশে উড়লেন। প্রায় আধ ঘণ্টায় তাঁরা উড়লেন ৮ কি.মি. পথ। সেদিন উৎসুক দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই-ও।

এসব খবর যতই ছড়াতে লাগল ততই লোকের উৎসাহ বাড়তে থাকল। বিশেষ করে যারা জীবনকে বাজি রেখে নতুন কিছু করতে চায় তারা তো রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠল। ফলে বেলুন তৈরির জিনিস থেকে অন্য আরো সব কিছুরই নানা উন্নতি ঘটতে থাকল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭ জানুয়ারি দুই বেলুন যাত্রীতো ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে রীতিমত সাড়া তুললেন। এরাঁ দুজন হলেন ব্লানচার্ড এবং জেফরিস। ওই বছরই জুন মাসে ডি. রোজিয়ার এবং তাঁর এক বন্ধু এইভাবে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড যাবার পথে দুর্ঘটনায় মারাই গেলেন।

বেলুন দিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালালেও যে ভাবে তাতে দুর্ঘটনা বাড়তে থাকে এই কারনেই ক্রমেই মানুষ বুঝল, আর যাইহোক বেলুন মানুষের আকাশযান হতে পারে না। তাই তাদের ভাবনাটা অন্য খাতে বইতে থাকল।

এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই এল উড়োজাহাজ। গতি নিয়ন্ত্রনের জন্য ইঞ্জিন এবং ইচ্ছেমত পথে চালাবার জন্য একটা হাল যোগ করে তৈরি হল উড়োজাহাজ। এই প্রথম উড়োজাহাজও তৈরি হয় ফ্রান্সেই। ১৮৫২ সালে হেনরি জিফার্ড তৈরি করলেন এই উড়োজাহাজ। জিফার্ড ছিলেন একজন সাধারণ রেলকর্মী। কিন্তু ওড়ার নেশা তাঁকে পরিণত করেছিল একজন সেরা ইঞ্জিনিয়ারে। জিফার্ড তাঁর তৈরি উড়োজাহাজের নামও দিলেন জিফার্ড।

উড়োজাহাজ নিয়ে ভাবনা ফ্রান্স ছাড়িয়ে অন্য দেশেও ছাড়িয়ে

পড়ল। ১৮৭২ সালে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার পল হেইনলিন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বদলে তাঁর উড়োজাহাজে যোগ করলেন ইনটারনাল কমবাসসন ইঞ্জিন।

ইঞ্জিনযুক্ত এবং যেমনভাবে খুশি চালাবার মত এই বেলুন উড়োজাহাজ এত শক্ত পোক্ত হয়ে উঠেছিল যে তাতে করে এক সময় রীতিমত মাল বওয়া শুরু হয়ে যায়। এই ধরনের উড়োজাহাজের যুগের ব্যাপ্তি ছিল মোটামুটি ৮৫ বছর। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর প্যারিসে জিফার্ড দিয়ে এর শুরু এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৬মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লকহার্স্ট—এ জেপেলিন দিয়ে এর শেষ।

উড়োজাহাজ গোষ্ঠীর মধ্যে এই জেপেলিনই ছিল সবচেয়ে সফল। ১৯০০ সালে জার্মানির গ্রাফ ফার্দিনান্দভন জেপেলিন ১২৬ মিটার লম্বা উড়োজাহাজটি তৈরি করে নিজের নামে তার নাম দেন জেপেলিন। লেক কনস্টান্সের ওপর দিয়ে উড়েছিল এটি।

১৯৩৭ সালের ৬মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লকহার্স্টে এক ভয়াবহ জেপালিন দুর্ঘটনায় ৩৬ যাত্রীর মৃত্যু হওয়ার পরই শেষ হয় এই উড়োজাহাজ অধ্যায়। এই জাহাজটি সেদিন এক বিস্ফোরণে আকাশের বুকেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এই উড়োজাহাজেরও প্রায় শ তিনেক বছর আগে লিওনার্দ দাভিঞ্চি ওড়ার জন্য একরকম যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। সে যন্ত্রের ডানা গুলি নাড়তে হবে চালককে হাত আর পা দিয়ে এবং লেজের দিকটা মাথা দিয়ে। তবে দা ভিঞ্চির ওই নকশা কৌতূহলোদ্দীপক হলেও তাতে সুনির্দিষ্ট তেমন কোন ফল পাওয়া যায়নি।

তবে ওই সময় থেকে যেসব প্রচেষ্টা চলতে থাকে তার মধ্যে মনে রাখার মত ঐতিহাসিক সময়টি হ'ল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ। ওই সময়ই উইলিয়াম হেনসন বাষ্পীয় ইঞ্জিন যোগ করে বিমান তৈরির নকশা করেন। এর আগে ১৮০৪ সালে জর্জ কেলে যে

গ্লাইডারের মডেল তৈরি করেন তাকেও বলা যায় বিমান তৈরির পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উড়োজাহাজ যখন তার কর্মক্ষমতার বা জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখনই জন্ম হয় এরোপ্লেন বা বিমানের। ক্লিমেণ্ট আডের এবং ওটো লিলিয়েনথালকেই সাধারণত এরোপ্লেনের জনক বলা হয়ে থাকে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আডের তাঁর প্রপেলার বা পরিচালক যন্ত্রটাকে মাটি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার ওপরে ওঠাতে এবং ৫০ মিটার পথ ওড়াতে সক্ষম হন। এটাকেই মানুষের প্রকৃত আকাশে ওড়া বলা যায়।

অন্যদিকে লিলিয়েনথান তাঁর গ্লাইডারের ডানাকে স্হির রেখে বিমান ওড়াবার যে ব্যবস্হা করেন তাকেই পরবর্তীকালের বিমান-প্রযুক্তির স্হায়ী রূপ বলা যায়। লিলিয়েনাথন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এক বিমান দুর্ঘটনায় যখন মারা যান তার আগে প্রায় একশবার তাঁর বিমানে আকাশ ভ্রমন করেছেন।

আধুনিক বিমান তৈরির ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন রাইট ভাইরা। বেলুন ওড়ানোর ক্ষেত্রে যেমন স্মরণীয় দুই মন্টগল-ফিয়ার ভাইয়ের নাম করতে হয় বিমান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তেমনই স্মরণীয় দুই রাইট ভাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওর ডেটনে বিমান তৈরির জন্য এক-সঙ্গে কাজ করে যান দুই রাইট ভাই অরভিল এবং উইলবার। তাঁরা যে বিমানটি তৈরি করেন তাতে ছিল ১২ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন। নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহকের কিন ডেভিন পাহাড়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ ডিসেম্বর অরভিল আকাশ ভ্রমণ করেন তাদের ওই ফ্লাইয়ার ১ বিমানে ৩০-৩৫ আকাশ মাইল গতিতে। অরভিলের পর ওইদিনই বিমান ওড়ায় তাঁর ভাই উইলবার। সেদিন মোট বারবার বিমান ওড়ানো হয় এবং উইলবারই সবচেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করেন। তিনি ৫৯ সেকেণ্ডে প্রায় ৮৫২ ফুট বা আধ মাইল আকাশ পথ

অতিক্রম করেন। অনেকেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই ১৭ ডিসেম্বর তারিখটাকে আধুনিক বিমান চালনার সূচনা বলে চিহ্নিত করতে চান।

১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে উইলবার রাইট ফ্রান্সে গিয়েলে



ম্যানসের কাছে তাঁর বিমান উড়িয়ে দেখান। ইউরোপ তিনি একশরও বেশি বার বিমান পড়ান এবং ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর্যন্ত তিনি আকাশে তাঁর বিমান নিয়ে ওড়েন।

১৯০৯ সালের ২৫ জুলাই ইতালিয় প্রযুক্তিবিদ অ্যালসানদ্রো আনজানির নকশায় তৈরি বিমান নিয়ে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর দিয়ে চড়ে যান লুইব্লেরিয়ট। ১৯১০ সালের ৭ জানুয়ারি হুবার্ট ল্যাথাম তাঁর বিমান নিয়ে ১৬০০ ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যান। ১৯১০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জিও চ্যাভেজ আলপস পর্বত সফল ভাবে পার হবার একবারে শেষ মুহূর্তে দুর্ঘটনায় প্রান হারান।

যাইহোক এরি মধ্যে বিমান তৈরির প্রথম কারখানাটি স্হাপিত হয় ফ্রান্সে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। ভয়লিন ফ্লোরেন্স নামে ওই কারখানাটি চালু করেন গ্যাব্রিয়ন এবং চার্লস ভয়সিন দুই ভাই। তাঁদের প্রথম বিমানটি আকাশে উড়তে না পারলেও দ্বিতীয় বিমান ৫০ অশ্বশক্তির বক্সাকাইট বাইপ্লেনটি উড়িয়ে দেখিয়ে ক্রেতাদের দেওয়া হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ।

বিমান যখন মোটামুটি সফল ও কার্যকর ভাবে আকাশে উড়ছে সেসময়ই শুরু প্রথম মহাযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধেও ব্যবহার করা শুরু হয়ে যায় বিমান। তার আগে ১৯১১ খৃষ্টাব্দেই অবশ্য ইতালিয়রা লিবিয়ার যুদ্ধে বিমান ব্যবহার করেন।

যাইহোক যতদিন যায় ততই বিমানের নানা উন্নতি হতে থাকে। তার গতি যেমন বাড়তে থাকে তেমনই তার নিরাপত্তাও বাড়তে থাকে। বিমানের উন্নতি ঘটতে ঘটতেই আবির্ভাব হয় জেটপ্লেনের। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ আগষ্ট ডঃ হানস ভন ওজেইনের নকশায় তৈরি প্রথম জেট বিমান ওড়ান রোষ্টকমেরিয়েসে। প্রথম জঙ্গী জেট হল মেসার্সচমিট এম ই ২৬২ এ। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এটি তৈরি হয়।

বিমানকে পরিবহনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজেও লাগানো হতে থাকে। বিমানে ডাক বহনের কাজ প্রথম চালু হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতে। ওই বছর ১৮ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ থেকে নৈনিতে বিমানে চিঠি বয়ে নিয়ে চালু হয় প্রথম বিমানডাক ব্যবস্হা।

বিমানে যাত্রী পরিবহনের সীমিত ব্যবস্হা প্রথম চালু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। বিমানকর্মীদের সঙ্গে বিমান-চালকদের নিয়োগ শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে।

বেলুন দিয়ে মানুষের যে ওড়ার যুগ শুরু হয়েছিল শব্দের চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন বিমানের যুগ পার হয়ে রকেটে তা এখন আরো এগিয়ে চলেছে রকেটে চড়ে মানুষ এখন মহাকাশেও পাড়ি দিচ্ছে প্রায় নিয়মিত আর এসবের ফলেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে দূরত্বও এখন গেছে কমে।

———



মানুষ প্রথম থেকেই একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক এবং যোগাযোগ রাখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। এই যোগাযোগ রাখার কাজটা তারা করত নানাভাবে। সেই প্রাচীন কালেও পাহাড়ের মাথায় আগুন জেবলে তারা সংকেত পাঠাত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। কখনও বা ঘণ্টাধ্বনি বা ঢাকের আওয়াজ দিয়ে তারা জানিয়ে দিত তাদের কথা বা সংকেত। আফ্রিকার জঙ্গলে কিছু-দিন আগেও সেখানকার আদিবাসীরা দামামা বাজিয়েই সংকেত পাঠাত। তারপরে মানুষ যখন পশু পাখিকে পোষমানাতে শিখল, শিখল লিখতে পড়তে তখন পায়রা বা ওই জাতীয় পোষমানা শিক্ষিত পাখির সঙ্গে চিঠি পাঠিয়ে কিংবা শুধু পাখি পাঠিয়ে বার্তা পাঠাত তারা। কিন্তু এতে মানুষের মনের সাধ মিটত না। তারা চাইত বহুদূর থেকেই অন্যের কথা শুনতে কিংবা দেখতে। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষার ফলেই একে একে উদ্ভাবিত হয় টেলিগ্রাফ, টেলিফোন বেতার এবং টেলিভিসনের।

বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শোনার মত বা দেখার মত বার্তা বা সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থাকেই বাংলায় বলে দূর-সমযোজন বা টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা। টেলি কথাটার অর্থ হ'ল দূর আর কমিউনিকেশনের অর্থ বার্তা। নানাভাবে এই বার্তা পাঠানো যায়। কিন্তু যেভাবেই বার্তা

পাঠান হোক না কেন তার জন্য মোটামুটিভাবে তিনটি বিশিষ্ট অংশের দরকার। এগুলি হল—(১) প্রেরকযন্ত্র (২) গ্রাহক-যন্ত্র এবং (৩) এই দুই যন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

এই ধরনের বার্তা পাঠাবার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীনতম হল টেলিগ্রাফ। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ প্রায় একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে খবর পাঠান বা সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা চালু হয়। দেশে রেলগাড়ি প্রবর্তন হওয়ার পরই এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা জরুরি হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্যামুয়েল মর্স এবং বৃটেনের স্যার চার্লস হুইটস্টোন এবং উইলিয়াম কুক কার্যকর বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের উদ্ভাবন করেন।

বৃটেনে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পেডিংটন থেকে স্লাউ পর্যন্ত গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলের টেলিগ্রাফ লাইন টানার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের জন্য তারবার্তা পাঠাবার কাজ শুরু হয়ে যায়। ওই বছর জানুয়ারি মাসেই রেল বোর্ডের সভায় ঠিক হয়েছিল ওই তারবার্তা পাঠাবার পেটেণ্ট গ্রহণকারী উইলিয়াম কুক বিনা পয়সায় রেল কোম্পানীকে তারবার্তা ব্যবহারের সুযোগ দেবেন, বদলে তিনি বা তাঁর লাইসেন্স গ্রহীতা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তার ব্যবস্থা চালু করার অনুমতি পাবেন। সেইমত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম তারবার্তাটি পাঠান হয় পেডিংটন থেকে স্লাউ পর্যন্ত ২০ মাইল লাইনে কুকের ডবল নিডল ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক টেলিগ্রাফের মাধ্যমে। প্রতি তারবার্তার জন্য মাশুল ছিল ১ শিলিং।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্যামুয়েল মর্স-ও ওয়াশিংটন থেকে প্রায় ৬·৪ কি.মি. দূরে বালটিমোরে প্রথম সংবাদ প্রেরণ করেন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। ভারতে প্রথম তারবার্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে অবশ্য বৃটিশরাই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল এই লাইন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিগ্রাফ ব্যবস্হা প্রবর্তনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে বালটিমোর প্যাট্রিয়টের এক সাংবাদিক ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা মর্স টেলিগ্রাফ ব্যবস্হার মাধ্যমে বালটিমোরে পাঠান এবং পরদিনই সেটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেটাকেই তার ব্যবস্হার মাধ্যমে সংবাদপত্রে খবর পাঠাবার প্রথম ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বৃটেনেও ওই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দেই টেলিগ্রাফের সাহায্যে খবর পাঠান হয় সংবাদপত্রে তবে তারিখটি ছিল ২ আগষ্ট। উইন্ডসর ক্যাসেল থেকে স্লাউ পেডিংটন লাইনে রানী ভিক্টোরিয়ার একটি পুত্র সন্তান জন্মানোর খবর পাঠান হয়েছিল টাইমস পত্রিকায়।

টেলিগ্রাফে সাধারণত দুটি যন্ত্র থাকে। একটি প্রেরক এবং অন্যটি গ্রাহকযন্ত্র। প্রেরকযন্ত্রের চাবিতে চাপ দিলেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে গ্রাহকযন্ত্রের তড়িৎ চুম্বককে চালু করে এবং লৌহাগুলিকে আকর্ষণ করে। ফলে শব্দ হয়। শব্দ প্রেরক-যন্ত্রের চাবির তারতম্যের ফলে গ্রাহকযন্ত্রেও শব্দের হেরফের ঘটে এবং সেই শব্দ ও তার হেরফেরের যে সাংকেতিক নিয়ম আছে তা শুনেই বোঝা যায় কি সংবাদ পাঠান হচ্ছে। বর্তমানে মিনিটে ২৫ থেকে ৩০ টি শব্দ পাঠান হয়। গ্রাহক এবং প্রেরকযন্ত্র তারের সাহায্যে যুক্ত থাকে। বৈদ্যুতিক সংকেত তারের মধ্য দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরই শক্তিহীন হয়ে পড়ে বলে রিপিটরের সাহায্যে এই শক্তি আবার বাড়ান হয়। রিপিটর একইসঙ্গে গ্রাহক ও প্রেরকযন্ত্রের কাজ করে। তড়িৎ চুম্বক ছাড়া ইলেকট্রন টিউব এবং ট্রানজিসটর রিপিটরও ব্যবহার করা হয়। ডুপ্লেক্স ব্যবস্হায় একইসঙ্গে দুদিকে, কোয়াড্রুপলেক্স ব্যবস্হার একইসঙ্গে দুদিকে দুটি করে খবর পাঠান যায়। এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্হারই আরো উন্নতি ঘটিয়ে পাওয়া গেছে টেলিপ্রিন্টার। এই টেলিগ্রাফ

পাঠান হোক না কেন তার জন্য মোটামুটিভাবে তিনটি বিশিষ্ট অংশের দরকার। এগুলি হল—(১) প্রেরকযন্ত্র (২) গ্রাহক-যন্ত্র এবং (৩) এই দুই যন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

এই ধরনের বার্তা পাঠাবার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীনতম হল টেলিগ্রাফ। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ প্রায় একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে খবর পাঠান বা সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা চালু হয়। দেশে রেলগাড়ি প্রবর্তন হওয়ার পরই এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা জরুরি হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্যামুয়েল মর্স এবং বৃটেনের স্যার চার্লস হুইটস্টোন এবং উইলিয়াম কুক কার্যকর বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের উদ্ভাবন করেন।

বৃটেনে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পেডিংটন থেকে স্লাউ পর্যন্ত গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলের টেলিগ্রাফ লাইন টানার কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের জন্য তারবার্তা পাঠাবার কাজ শুরু হয়ে যায়। ওই বছর জানুয়ারি মাসেই রেল বোর্ডের সভায় ঠিক হয়েছিল ওই তারবার্তা পাঠাবার পেটেণ্ট গ্রহণকারী উইলিয়াম কুক বিনা পয়সায় রেল কোম্পানীকে তারবার্তা ব্যবহারের সুযোগ দেবেন, বদলে তিনি বা তাঁর লাইসেন্স গ্রহীতা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তার ব্যবস্থা চালু করার অনুমতি পাবেন। সেইমত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম তারবার্তাটি পাঠান হয় পেডিংটন থেকে স্লাউ পর্যন্ত ২০ মাইল লাইনে কুকের ডবল নিডল ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক টেলিগ্রাফের মাধ্যমে। প্রতি তারবার্তার জন্য মাশুল ছিল ১ শিলিং।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্যামুয়েল মর্স-ও ওয়াশিংটন থেকে প্রায় ৬·৪ কি.মি. দূরে বালটিমোরে প্রথম সংবাদ প্রেরণ করেন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে। ভারতে প্রথম তারবার্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে অবশ্য বৃটিশরাই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল এই লাইন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে বালটিমোর প্যাট্রিয়টের এক সাংবাদিক ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা মর্স টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার মাধ্যমে বালটিমোরে পাঠান এবং পরদিনই সেটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেটাকেই তার ব্যবস্থার মাধ্যমে সংবাদপত্রে খবর পাঠাবার প্রথম ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বৃটেনেও ওই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দেই টেলিগ্রাফের সাহায্যে খবর পাঠান হয় সংবাদপত্রে তবে তারিখটি ছিল ২ আগষ্ট। উইন্ডসর ক্যাসেল থেকে স্লাউ পেডিংটন লাইনে রানী ভিক্টোরিয়ার একটি পুত্র সন্তান জন্মানোর খবর পাঠান হয়েছিল টাইমস পত্রিকায়।

টেলিগ্রাফে সাধারণত দুটি যন্ত্র থাকে। একটি প্রেরক এবং অন্যটি গ্রাহকযন্ত্র। প্রেরকযন্ত্রের চাবিতে চাপ দিলেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে গ্রাহকযন্ত্রের তড়িৎ চুম্বককে চালু করে এবং লৌহাগুলিকে আকর্ষণ করে। ফলে শব্দ হয়। শব্দ প্রেরক-যন্ত্রের চাবির তারতম্যের ফলে গ্রাহকযন্ত্রেও শব্দের হেরফের ঘটে এবং সেই শব্দ ও তার হেরফেরের যে সাংকেতিক নিয়ম আছে তা শুনেই বোঝা যায় কি সংবাদ পাঠান হচ্ছে। বর্তমানে মিনিটে ২৫ থেকে ৩০ টি শব্দ পাঠান হয়। গ্রাহক এবং প্রেরকযন্ত্র তারের সাহায্যে যুক্ত থাকে। বৈদ্যুতিক সংকেত তারের মধ্য দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরই শক্তিহীন হয়ে পড়ে বলে রিপিটরের সাহায্যে এই শক্তি আবার বাড়ান হয়। রিপিটর একইসঙ্গে গ্রাহক ও প্রেরকযন্ত্রের কাজ করে। তড়িৎ চুম্বক ছাড়া ইলেকট্রন টিউব এবং ট্রানজিসটর রিপিটরও ব্যবহার করা হয়। ডুপ্লেক্স ব্যবস্থায় একইসঙ্গে দুদিকে, কোয়াড্রুপলেক্স ব্যবস্থার একইসঙ্গে দুদিকে দুটি করে খবর পাঠান যায়। এই টেলিগ্রাফ ব্যবস্থারই আরো উন্নতি ঘটিয়ে পাওয়া গেছে টেলিপ্রিন্টার। এই টেলিগ্রাফ

ব্যবস্থায় আপনা আপনিই গ্রাহকযন্ত্রে খবর ছাপা হয়ে যায় টাইপ-রাইটারে টাইপ করার মত। এছাড়া অয়্যারলেস বা বেতারের সাহায্যেও টেলিগ্রাফ সংকেত পাঠান হয়ে থাকে।

টেলিগ্রাফের সাহায্যে বার্তা বা সংকেত দূরে পাঠাবার যন্ত্র উদ্ভাবনের পরও কিন্তু মানুষের আশা মিটল না। শুধু বার্তা পাঠান না, সে চাইল সরাসরি তার প্রয়োজনের লোকটির সঙ্গে কথা বলতে, তার এই চাহিদারই ফল টেলিফোন।

যদিও আধুনিক কথা বলবার যন্ত্র টেলিফোনের উদ্ভাবন করেন এক স্কটিশ ডাক্তার আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে —তবু টেলিফোনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ধ্বনি তরঙ্গ পাঠানো এবং শোনার প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কিউবার অন্তর্গত হাভানার ফ্লোরেন্সে। ওইসময় অ্যান্টনিও মিউসি নামে এক ভদ্রলোক একতলা থেকে চারতলায় তাঁর পঙ্গু স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু ভদ্রলোক ছিলেন খুব গরিব তাই এর পেটেন্ট নিতে পারেননি। তাঁর ওই যন্ত্রটিতে কথাবার্তা খুব একটা পরিষ্কারভাবে শোনা যেত না বলেই মনে হয়।

এরপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে ফ্রেডারিক ডোরফের জোহান ফিলিপ রিজ একটি বেহালার বাক্স. বিয়ারের ফাঁপা ব্যারেল এবং শুকনো চামড়া দিয়ে একটি টেলিফোন যন্ত্র তৈরি করে সবাইকে দেখান। ফ্রাঙ্কফুর্টের ফিজিক্স সোসাইটিতে এরই একটি উন্নত নিদর্শন দেখান হয় ১৮৬১ খৃঃ-র ২৬ অক্টোবর। তবে ওই যন্ত্র নিয়ে আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—তাতে কথা বা গান হঠাৎ হঠাৎ-ই শোনা যেত।

স্কটিশ ডাক্তার আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল আমেরিকার নাগরিক হয়ে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন। সেখানেই তিনি এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যাতে টানা কথাবার্তা বলা এবং শোনা

যেত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৯ মার্চ ডঃ বেল যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন এবং ১০ মার্চ তাঁর সহকর্মীর প্রতি পাঠান আধুনিক টেলিফোনের প্রথম আহ্বান—কাম হিয়ার ওয়াটসন, আই ওয়াণ্ট ইউ—ওয়াটসন চলে এসো, তোমাকে আমার দরকার।

গ্রাহাম উদ্ভাবিত এই টেলিফোন যন্ত্র সবার ব্যবহারের জন্য প্রথম টেলিফোন লাইন বসান চার্লস উইলিয়াম জুনিয়র তাঁর বাড়ি সোমারভিল থেকে অফিস বোষ্টনে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম টেলিফোন লাইন বসান কেমব্রিজ বোর্ড অব্ ওয়াটর ওয়ার্কস ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। টেলিফোনে প্রথম সুইচবোর্ড বসানো হয় বোষ্টনেই হোমস বার্গলার কোম্পানিতে। প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসান হয় কানেকটিকাটের হার্টফোর্ডে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ আগষ্ট। প্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনেই পেটেন্টনের কানসাস সিটির অ্যামসন বি. স্ট্রোগার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ভারতে প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এবং প্রথম স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ বসে সিমলায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে।

টেলিফোনেরও প্রধান অঙ্গ দু'টি। একটির দ্বারা শব্দকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে এবং বিদ্যুৎ তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়। এই যন্ত্রটি থাকে গ্রাহকদের বাড়িতে। অন্যটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। এখানেই একটি টেলিফোন যন্ত্রকে অন্য একটি টেলিফোন যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শব্দকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হয় মাইক্রোফেনের সাহায্যে। শব্দ হলে বাতাসে চাপের যে হেরফের হয় তা অঙ্গার পূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠের রোধের (রেজিস্টান্স) হেরফের ঘটায়, ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহে শব্দ তরঙ্গের একইরকম পরিবর্তন হয়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ স্পিকারের সাহায্যে আবার শব্দ তরঙ্গে পরিণত হয়।

আগে মানুষই এক্সচেঞ্জে বসে একই টেলিফোনের সঙ্গে অন্য টেলিফোনের সংযোগ ঘটিয়ে দিত কিন্তু এখন স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন

ব্যবস্থায় আপনা আপনিই গ্রাহকযন্ত্রে খবর ছাপা হয়ে যায় টাইপ-রাইটারে টাইপ করার মত। এছাড়া অয়্যারলেস বা বেতারের সাহায্যেও টেলিগ্রাফ সংকেত পাঠান হয়ে থাকে।

টেলিগ্রাফের সাহায্যে বার্তা বা সংকেত দূরে পাঠাবার যন্ত্র উদ্ভাবনের পরও কিন্তু মানুষের আশা মিটল না। শুধু বার্তা পাঠান না, সে চাইল সরাসরি তার প্রয়োজনের লোকটির সঙ্গে কথা বলতে, তার এই চাহিদারই ফল টেলিফোন।

যদিও আধুনিক কথা বলবার যন্ত্র টেলিফোনের উদ্ভাবন করেন এক স্কটিশ ডাক্তার আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে —তবু টেলিফোনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ধ্বনি তরঙ্গ পাঠানো এবং শোনার প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কিউবার অন্তর্গত হাভানার ফ্লোরেন্সে। ওইসময় অ্যান্টনিও মিউসি নামে এক ভদ্রলোক একতলা থেকে চারতলায় তাঁর পঙ্গু স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু ভদ্রলোক ছিলেন খুব গরিব তাই এর পেটেণ্ট নিতে পারেননি। তাঁর ওই যন্ত্রটিতে কথাবার্তা খুব একটা পরিষ্কারভাবে শোনা যেত না বলেই মনে হয়।

এরপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে ফ্রেডারিক ডোরফের জোহান ফিলিপ রিজ একটি বেহালার বাক্স. বিয়ারের ফাঁপা ব্যারেল এবং শুকনো চামড়া দিয়ে একটি টেলিফোন যন্ত্র তৈরি করে সবাইকে দেখান। ফ্রাঙ্কফুর্টের ফিজিক্স সোসাইটিতে এরই একটি উন্নত নিদর্শন দেখান হয় ১৮৬১ খৃঃ-র ২৬ অক্টোবর। তবে ওই যন্ত্র নিয়ে আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—তাতে কথা বা গান হঠাৎ হঠাৎ-ই শোনা যেত।

স্কটিশ ডাক্তার আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল আমেরিকার নাগরিক হয়ে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন। সেখানেই তিনি এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যাতে টানা কথাবার্তা বলা এবং শোনা

যেত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৯ মার্চ ডঃ বেল যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন এবং ১০ মার্চ তাঁর সহকর্মীর প্রতি পাঠান আধুনিক টেলিফোনের প্রথম আহ্বান – কাম হিয়ার ওয়াটসন, আই ওয়ান্ট ইউ – ওয়াটসন চলে এসো, তোমাকে আমার দরকার।

গ্রাহাম উদ্ভাবিত এই টেলিফোন যন্ত্র সবার ব্যবহারের জন্য প্রথম টেলিফোন লাইন বসান চার্লস উইলিয়াম জুনিয়র তাঁর বাড়ি সোমারভিল থেকে অফিস বোষ্টনে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম টেলিফোন লাইন বসান কেমব্রিজ বোর্ড অব্ ওয়াটর ওয়ার্কস ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। টেলিফোনে প্রথম সুইচবোর্ড বসানো হয় বোষ্টনেই হোমস বার্গলার কোম্পানিতে। প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসান হয় কানেকটিকাটের হার্টফোর্ডে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ আগষ্ট। প্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনেই পেটেন্টনের কানসাস সিটির অ্যামসন বি. স্ট্রোগার ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ভারতে প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এবং প্রথম স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জ বসে সিমলায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে।

টেলিফোনেরও প্রধান অঙ্গ দু'টি। একটির দ্বারা শব্দকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে এবং বিদ্যুৎ তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়। এই যন্ত্রটি থাকে গ্রাহকদের বাড়িতে। অন্যটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। এখানেই একটি টেলিফোন যন্ত্রকে অন্য একটি টেলিফোন যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শব্দকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিবর্তিত করা হয় মাইক্রোফেনের সাহায্যে। শব্দ হলে বাতাসে চাপের যে হেরফের হয় তা অঙ্গার পূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠের রোধের (রেজিস্টান্স) হেরফের ঘটায়, ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহে শব্দ তরঙ্গের একইরকম পরিবর্তন হয়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ স্পিকারের সাহায্যে আবার শব্দ তরঙ্গে পরিণত হয়।

আগে মানুষই এক্সচেঞ্জে বসে একই টেলিফোনের সঙ্গে অন্য টেলিফোনের সংযোগ ঘটিয়ে দিত কিন্তু এখন স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন

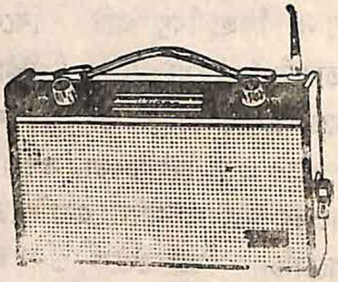
ব্যবস্থাই বেশি চালু। যাই হোক, টেলিফোন এখন পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের মানুষের কণ্ঠ শোনার সুযোগ এনে পৃথিবীর দূরত্বটাকে যেন একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে।

টেলিগ্রাফ যন্ত্র বা টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে মানুষে মানুষে যোগাযোগের সুযোগটা বহুগুণ বেড়ে গেল কিন্তু এগুলিতে সংকেত বা কথা পাঠাতে হয় তারের মধ্য দিয়ে। ফলে এতে মাঝেমাঝেই কিছু না কিছু বিঘ্ন ঘটে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তার ছিঁড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই মানুষ চিন্তা করতে থাকে বেতার বা তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থার। মানুষের চিন্তাই তাকে এনে দিল বেতার যন্ত্র।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের ম্যালন লুমিস ভার্জিনিয়ার ক্যাটোচিন রিজ থেকে ১৪ মাইল দূরে রিয়ার্ডেন বেতারের মাধ্যমে বার্তা পাঠাতে সক্ষম হন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২০ জুলাই তাঁর এই বেতার যন্ত্রটির পেটেন্ট নেন, তবে প্রথম বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন ডেভিড এডওয়ার্ড হিউজেস ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি তার আবিষ্কারের বিষয়বস্তু প্রকাশ না করায় জার্মান গবেষক হেইনরিখ হার্টজকেই বেতার তরঙ্গের অস্তিত্বের কথা প্রকাশের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তিনি ১৮৮৭-৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে গবেষণা করেন তাতেই বেতার তারবার্তা ও বেতার সম্প্রসারণের পথ খুলে যায়।

বাণিজ্যিক স্তরে বেতার বা রেডিও প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবক ইতালির মারকনি সাহেব। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের টয়নবি হলে তিনি তাঁর যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখান এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বেতার যন্ত্রাংশ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ এণ্ড সিগন্যান কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। মারকনির আগেই ভারতের জগদীশচন্দ্র বসু বেতার তরঙ্গের মধ্য দিয়ে শব্দ তরঙ্গ পাঠাবার যন্ত্র উদ্ভাবক করেন। কিন্তু তিনি তার পেটেন্টে না নেওয়ায় বেতার উদ্ভাবকের সম্মান থেকে বঞ্চিত হন।

বিশ্বের প্রথম স্থায়ী বেতার কেন্দ্র হল আইজল অব বের নিডল হোটেল ওয়ারলস স্টেশন। বিশ্বের প্রথম বেতার প্রচার শুরু হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে নিয়মিত বেতার প্রচারের শুরু নিউইয়র্কে।



বেতার বা রেডিও একই সঙ্গে বিনোদন এবং শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে এবং অতিদ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনার কথাও বেতারের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়; ফলে বেতার এখন বিশ্বকে করে তুলছে অনেক ছোট।

সরাসরি কথা বলা অথবা পৃথিবীর অন্য প্রান্তের অনুষ্ঠান শোনার বাসনা মেটার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে সেই দূরের মানুষটিকে দেখার বাসনা পেয়ে বসে এবং তার সে বাসনা পূর্ণ হয় দূরদর্শন বা টেলিভিশন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে।

পৃথিবীর নানা দেশে একইসঙ্গে টেলিভিশন উদ্ভাবনের চেষ্টা চললেও একাজে প্রথম সফল হন জন লোগি বেয়ার্ড নামে এক স্কটিশ বিজ্ঞানী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর। লণ্ডনের এক চিলেকোঠায় বেয়ার্ড তাঁর পরীক্ষাগারে আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে একটি চলমান বস্তুর ছবি বেতার তরঙ্গের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে সক্ষম হন। একটা

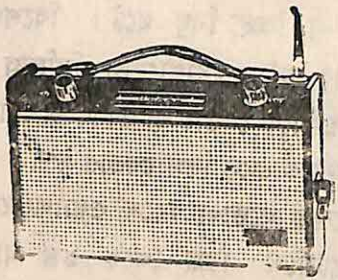
ব্যবস্থাই বেশি চালু। যাই হোক, টেলিফোন এখন পৃথিবীর একপ্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের মানুষের কণ্ঠ শোনার সুযোগ এনে পৃথিবীর দূরত্বটাকে যেন একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে।

টেলিগ্রাফ যন্ত্র বা টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে মানুষে মানুষে যোগাযোগের সুযোগটা বহুগুণ বেড়ে গেল কিন্তু এগুলিতে সংকেত বা কথা পাঠাতে হয় তারের মধ্য দিয়ে। ফলে এতে মাঝেমাঝেই কিছু না কিছু বিঘ্ন ঘটে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তার ছিঁড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই মানুষ চিন্তা করতে থাকে বেতার বা তারহীন যোগাযোগ ব্যবস্থার। মানুষের চিন্তাই তাকে এনে দিল বেতার যন্ত্র।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের ম্যালন লুমিস ভার্জিনিয়ার ক্যাটোচিন রিজ থেকে ১৪ মাইল দূরে রিয়ার্স ডেন বেতারের মাধ্যমে বার্তা পাঠাতে সক্ষম হন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২০ জুলাই তাঁর এই বেতার যন্ত্রটির পেটেন্ট নেন, তবে প্রথম বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন ডেভিড এডওয়ার্ড হিউজেস ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তিনি তার আবিষ্কারের বিষয়বস্তু প্রকাশ না করায় জার্মান গবেষক হেইনরিখ হার্টজকেই বেতার তরঙ্গের অস্তিত্বের কথা প্রকাশের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। তিনি ১৮৮৭-৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে গবেষণা করেন তাতেই বেতার তারবার্তা ও বেতার সম্প্রসারণের পথ খুলে যায়।

বাণিজ্যিক স্তরে বেতার বা রেডিও প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবক ইতালির মারকনি সাহেব। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের টয়নবি হলে তিনি তাঁর যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখান এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বেতার যন্ত্রাংশ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ এণ্ড সিগন্যাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। মারকনির আগেই ভারতের জগদীশচন্দ্র বসু বেতার তরঙ্গের মধ্য দিয়ে শব্দ তরঙ্গ পাঠাবার যন্ত্র উদ্ভাবক করেন। কিন্তু তিনি তার পেটেন্টে না নেওয়ায় বেতার উদ্ভাবকের সম্মান থেকে বঞ্চিত হন।

বিশ্বের প্রথম স্থায়ী বেতার কেন্দ্র হল আইজল অব বের নিডল হোটেল ওয়ারলস স্টেশন। বিশ্বের প্রথম বেতার প্রচার শুরু হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে নিয়মিত বেতার প্রচারের শুরু নিউইয়র্কে।



বেতার বা রেডিও একই সঙ্গে বিনোদন এবং শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে এবং অতিদ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ঘটনার কথাও বেতারের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়; ফলে বেতার এখন বিশ্বকে করে তুলছে অনেক ছোট।

সরাসরি কথা বলা অথবা পৃথিবীর অন্য প্রান্তের অনুষ্ঠান শোনার বাসনা মেটার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে সেই দূরের মানুষটিকে দেখার বাসনা পেয়ে বসে এবং তার সে বাসনা পূর্ণ হয় দূরদর্শন বা টেলিভিশন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে।

পৃথিবীর নানা দেশে একইসঙ্গে টেলিভিশন উদ্ভাবনের চেষ্টা চললেও একাজে প্রথম সফল হন জন লোগি বেয়ার্ড নামে এক স্কটিশ বিজ্ঞানী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর। লন্ডনের এক চিলেকোঠায় বেয়ার্ড তাঁর পরীক্ষাগারে আলো ও ছায়া পর্যায়ক্রমে একটি চলমান বস্তুর ছবি বেতার তরঙ্গের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে সক্ষম হন। একটা

চায়ের পেটি, বিস্কুট টিন, সাইকেল বাতির কাঁচ, বাতিল ইলেকট্রিক মোটর, পিয়ানোর তার এইসব নিয়ে মাত্র ১২ শিলিং খরচ করে তিনি তৈরি করেন তাঁর টেলিভিশন যন্ত্রটি।

বেয়ার্ড ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৭ জানুয়ারি প্রথম সাংবাদিকদের তাঁর এই টেলিভিশন দেখান। সেদিন পর্দায় ভেসে উঠেছিল ক্যাপ্টেন ওজি হুচিংসনের মাথা। ২৭ জানুয়ারি তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউটে ৪০ জন বিজ্ঞানীকে দেখান তাঁর টেলিভিশন। ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে বেয়ার্ড-ই প্রথম সারে থেকে নিউইয়র্ক টেলিভিশনের মাধ্যমে ছবি পাঠান। রঙিন টেলিভিশন উদ্ভাবনের কৃতিত্বও বেয়ার্ডেরই। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেই টেলিভিশন রেকর্ড করার পদ্ধতি ফোনোভিসন উদ্ভাবন করেন বেয়ার্ড।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে জিইসির ডবলিউ জি ওয়াইকেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট সময়ে টেলিভিশন প্রচার শুরু হয়।

উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্হা প্রবর্তিত হবার পর এখন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের অনুষ্ঠান বা ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে অন্যপ্রান্তে বসে দেখা যায়। ফলে অলিম্পিক অথবা মার্কিন প্রেসিডেন্টের শপথ বা ফ্রান্স বা মস্কোতে ভারত উৎসবের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে বসে দেখার সুযোগ পাচ্ছে মানুষ।

মানব সভ্যতার পথে এগিয়ে চলার এই যে কাহিনী, আদিম মানুষের প্রতিদিনের যে অভিজ্ঞতা, তাকে মানুষ ধরে রাখতে চায় তার উত্তর পুরুষদের জন্য। কেমন করে তারা নানা ভয়, বিপদ আপদ এবং তাকে জয় করছে তার কথা, চলার পথে নতুন আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের কথা পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর ভাবনা থেকেই মানুষের মাথায় এল লেখার চিন্তা। তখনও লিপি কোন নির্দিষ্ট রূপ না পাওয়ায় কথা নানা সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে, ছবি এঁকে মানুষ তার ভাবনা চিন্তাকে ধরে রাখত।

আজকের যেটি ইরাক, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সেই রাজ্যের আগের নাম ছিল মেসোপটোমিয়া। এই মোসোপটোমিয়ার সুমেরিয়রাই সম্ভবত প্রথম সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে ঘটনা বা মনের ভাবের কথা লিখে রাখতে শুরু করে। হয় নরম মাটির মধ্যে কিংবা পাথরের

বুক কুঁদে এসব চিহ্ন আঁকা হত। বিভিন্ন জিনিসকে বোঝাবার জন্য এই সুমেরিয়রা দু'হাজারের বেশি সাংকেতিক চিহ্ন উদ্ভাবন করে। কিন্তু এটি তাদের লেখাকে এত জটিল করে তোলে যে খুব কম লোকেই তা বুঝতে পারত। তাদের এই পদ্ধতির অনেকটা



অশোকস্তম্ভের শিলালিপি

উন্নতি ঘটায় মিসরিয়রা। তারা হিরোগ্লিফিকস নামে যে লিপি উদ্ভাবন করে তাতে বর্ণের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক ডজন এবং তা দিয়ে কয়েক হাজার শব্দ বানান করেই লেখা যেত। ফোসিয়ানরা এই ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় জবং গ্রিকরা আবার তার আরো অনেক উন্নতি ঘটায়। এট্রুসকান এবং রোমানদের হাত ঘুরে যে অক্ষর-মালা আসে তা অনেকটাই আজকের ইংরেজি লিপির মত। ছবি বা সাংকেতিক চিহ্নে দিয়ে লেখার পদ্ধতির অনেকটা এখনও চীনা ভাষায় মেনে চলা হয়।

যাইহোক, এই লিপি উদ্ভাবনের পরই শুরু হয় বই লেখা। প্রাচীনকালে হাতেই বইলেখা হত। ছাপার কাজ শুরু হয় সম্ভবত চীনে। ৮৬৮ খৃস্টাব্দে চীনে 'হীরকসূত্র' নামে ছাপা একটি বৌদ্ধ বইকেই প্রথম ছাপা বইয়ের সম্মান দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আজ যে উন্নতি ঘটেছে তাতে দূর আর দূর নয়, অপরিচিত নয় আজ কোন কিছুই এমনকি পরও আজ আপন হয়ে উঠেছে জানার মাধ্যমে।

তাই আজ এসব মাধ্যম সম্পর্কে কবির ভাষায় বলতে হয়—'কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই—দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু পরকে করিলে ভাই।'

চায়ের পেটি, বিস্কুট টিন, সাইকেল বাতির কাঁচ, বাতিল ইলেকট্রিক মোটর, পিয়ানোর তার এইসব নিয়ে মাত্র ১২ শিলিং খরচ করে তিনি তৈরি করেন তাঁর টেলিভিশন যন্ত্রটি।

বেয়ার্ড ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ৭ জানুয়ারি প্রথম সাংবাদিকদের তাঁর এই টেলিভিশন দেখান। সেদিন পর্দায় ভেসে উঠেছিল ক্যাপ্টেন ওজি হুচিংসনের মাথা। ২৭ জানুয়ারি তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউটে ৪০ জন বিজ্ঞানীকে দেখান তাঁর টেলিভিশন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বেয়ার্ড-ই প্রথম সারে থেকে নিউইয়র্ক টেলিভিশনের মাধ্যমে ছবি পাঠান। রঙিন টেলিভিশন উদ্ভাবনের কৃতিত্বও বেয়ার্ডেরই। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দেই টেলিভিশন রেকর্ড করার পদ্ধতি ফোনোভিসন উদ্ভাবন করেন বেয়ার্ড।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কে জিইসির ডবলিউ জি ওয়াইকেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট সময়ে টেলিভিশন প্রচার শুরু হয়।

উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর এখন পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের অনুষ্ঠান বা ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে অন্যপ্রান্তে বসে দেখা যায়। ফলে অলিম্পিক অথবা মার্কিন প্রেসিডেন্টের শপথ বা ফ্রান্স বা মস্কোতে ভারত উৎসবের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে বসে দেখার সুযোগ পাচ্ছে মানুষ।

মানব সভ্যতার পথে এগিয়ে চলার এই যে কাহিনী, আদিম মানুষের প্রতিদিনের যে অভিজ্ঞতা, তাকে মানুষ ধরে রাখতে চায় তার উত্তর পুরুষদের জন্য। কেমন করে তারা নানা ভয়, বিপদ আপদ এবং তাকে জয় করছে তার কথা, চলার পথে নতুন আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের কথা পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর ভাবনা থেকেই মানুষের মাথায় এল লেখার চিন্তা। তখনও লিপি কোন নির্দিষ্ট রূপ না পাওয়ায় কথা নানা সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে, ছবি এঁকে মানুষ তার ভাবনা চিন্তাকে ধরে রাখত।

আজকের যেটি ইরাক, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সেই রাজ্যের আগের নাম ছিল মেসোপটেমিয়া। এই মোসোপটেমিয়ার সুমেরিয়রাই সম্ভবত প্রথম সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে ঘটনা বা মনের ভাবের কথা লিখে রাখতে শুরু করে। হয় নরম মাটির মধ্যে কিংবা পাথরের

বুক কুঁদে এসব চিহ্ন আঁকা হত। বিভিন্ন জিনিসকে বোঝাবার জন্য এই সুমেরিয়রা দু'হাজারের বেশি সাংকেতিক চিহ্ন উদ্ভাবন করে। কিন্তু এটি তাদের লেখাকে এত জটিল করে তোলে যে খুব কম লোকেই তা বুঝতে পারত। তাদের এই পদ্ধতির অনেকটা



অশোকস্তম্ভের শিলালিপি

উন্নতি ঘটায় মিসরিয়রা। তারা হিরোগ্লিফিকস নামে যে লিপি উদ্ভাবন করে তাতে বর্ণের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক ডজন এবং তা দিয়ে কয়েক হাজার শব্দ বানান করেই লেখা যেত। ফোসিয়ানরা এই ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় জবং গ্রিকরা আবার তার আরো অনেক উন্নতি ঘটায়। এট্রুসকান এবং রোমানদের হাত ঘুরে যে অক্ষর-মালা আসে তা অনেকটাই আজকের ইংরেজি লিপির মত। ছবি বা সাংকেতিক চিহ্নে দিয়ে লেখার পদ্ধতির অনেকটা এখনও চীনা ভাষায় মেনে চলা হয়।

যাইহোক, এই লিপি উদ্ভাবনের পরই শুরু হয় বই লেখা। প্রাচীনকালে হাতেই বইলেখা হত। ছাপার কাজ শুরু হয় সম্ভবত চীনে। ৮৬৮ খৃস্টাব্দে চীনে 'হীরকসূত্র' নামে ছাপা একটি বৌদ্ধ বইকেই প্রথম ছাপা বইয়ের সম্মান দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার আজ যে উন্নতি ঘটেছে তাতে দূর আর দূর নয়, অপরিচিত নয় আজ কোন কিছুই এমনকি পরও আজ আপন হয়ে উঠেছে জানার মাধ্যমে।

তাই আজ এসব মাধ্যম সম্পর্কে কবির ভাষায় বলতে হয়—'কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই—দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু পরকে করিলে ভাই।'